প্রবন্ধ ত্রয়ী

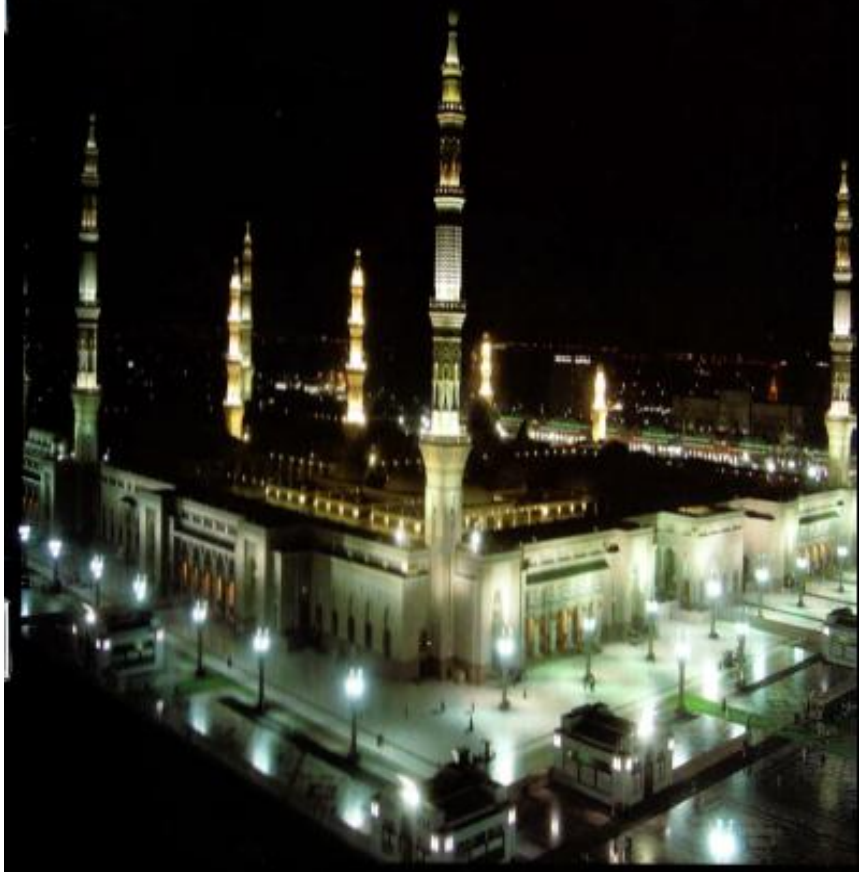

ডক্টর আ.ফ.ম.আবু বকর সিদ্দীক

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুন্‌শী মোহাম্মদ বরকত উলাহ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স, ১৯৬৭ সালে এম এ এবং ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর "Shaikh Ahmed Sirhindi (Rh.) and his Reforms" শীর্ষক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মে, ১৯৬৮ থেকে মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত সরকারী চিটাগাং কলেজে আরবী প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। সরকারী বি.এল কলেজ খুলনায় ২৬-০৫-৬৯ থেকে ৩০-০৫-৭৮ পর্যন্ত লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-০৬-৭৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকার পর ৩০-০১-১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর ১৯৮৯ সাল থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা, স্যার এ.এফ. রহমান হলের হাউস টিউটর ও প্রক্টোর (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে : ১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র); ২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব; ৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রঃ); ৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)- জীবন ও কর্ম; ৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ; ৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া; ৮. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া; ৯. মাবদা ওয়া মা'আদ; ১০. ইছবাতুন নুবুওয়াত; ১১. আবু দাউদ শরীফ (১ম-৫ম খণ্ড); ১২. রিসালায়ে তাহলীলিয়া; ১৩. স্মরণকালের মরণজয়ী; ১৪. আল-কুরআনের সরল তরজমা (অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৫. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৭. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ ৩০তম পারা (অনুবাদক, ই.ফা.বা.); ১৯. সিরাতুন্নবী (স.)- ইবনে হিশাম ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ২০. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ২১. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ; ২২. রূহের সফর; ২৩. নামায পড়ে হবে কি?

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমীর একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার যোগদান উপলক্ষে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও ইরান সফর করেন। অধ্যাপনা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুজাদ্দেদিয়া কমপ্লেক্স নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ ক'জন গবেষক এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী করেছেন।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বিগত ৩০-৬-০৮ সনে ৬৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বিভাগের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৫-৯-০৮ইং থেকে এ্যাড হক ভিত্তিতে সুপার নিউ মেরারী অধ্যাপক বা সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন।

www.khasmujaddidia.org

cÖeÜ-Îqx

রাহে নাজাত-৬

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রবন্ধ-ত্রয়ী
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৯০২৮১৮৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
কার্তিক ১৪২০ বাংলা
জিলহজ্ব ১৪৩৪ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : ২০.০০ টাকা মাত্র

PROBANDO TROYI : by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali.
Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B,

Section # 12, Mirpur, Pallabi, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-9028188, website : www.khasmujaddidia.org.

Price : Tk. 20.00 Only.

লেখকের অন্যান্য বই :

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মাআরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খণ্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্‌হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৩. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)
২৫. নামাজ পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)

৬ - প্রবন্ধ-ত্রয়ী

২৭. যিকির কি ও কেন? (রাহে নাজাত-৪)
২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা
২৯. আল্-কুরআন : কালামুল্লাহ

সূচীপত্র

প্রবন্ধ-১ : সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইয়াতের মর্যাদা ॥ ৬
প্রবন্ধ-২ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ ॥ ১২
প্রবন্ধ-৩ : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ॥ ২০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেশ কালাম

আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন। ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী আজমা'ঈন। আম্মা বাদ :

'প্রবন্ধ ত্রয়ী' গ্রন্থের পরিচয় নামের দ্বারাই জানা যায়। তিনটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে এটা প্রকাশ করা হচ্ছে। যার বিবরণ এরূপ :

প্রবন্ধ-১ : সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইয়াতের মর্যাদা।

প্রবন্ধ-২ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ।

প্রবন্ধ-৩ : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ ও মংগল নিহীত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁর আহ্লে বাইয়াতের অনুসরণ, অনুকরণ ও তাঁদের প্রতি ভক্তি, মহব্বত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে, এ উদ্দেশ্যে এটি রচিত হলো। আল্লাহ্ আমাদের তাওফিক দান করুন তাঁদের ইত্তেবা বা অনুসরণ করার। আমীন!

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রবন্ধ-১

সাহাবায়ে কিরাম ও আহ্‌লে বাইয়াতের মর্যাদা

'সাহাবী' শব্দটি আরবী ভাষার 'সুহ্‌বত' শব্দের একটি রূপ। এক বচনে 'সাহেব' ও 'সাহাবী' এবং বহুবচনে 'সাহাবা' ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ- সংগী, সাথী, সহচর, এক সাথে জীবন যাপনকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান সংগী-সাথীদের বুঝায়।

আল্লামা ইবন হাজার আস্‌কালানী (রহ.) বলেছেন : সাহাবী সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছে।

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লামের 'সুহ্‌বত' বা সাহচর্য এমন একটি মর্যাদা, যার সমকক্ষ আর কোন মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহ্‌বতের মর্যাদা ছাড়া ও দ্বীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করা, ইসলামের তাব্‌লীগ ও শরীয়তের খিদমতের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবায়ে কিরামের একটি পবিত্র ও উঁচু মর্যাদা আছে। এ কারণে কোন কোন আলিমের মতে সাহাবীদেরকে হেয় প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি 'যিন্‌দীক'। আর কেউ কেউ বলেন : এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাহাবীদের পরস্পরের মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে; কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুনী ও সাধক হোন না কেন, কেউ-ই একজন সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাত এবং ইজ্‌মা একমত।

এ সাহাবীরাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রথম মধ্য-সূত্র। পরবর্তী উম্মাত আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনে ব্যাখ্যা, আল্লাহ্‌র রাসূলের পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দ্বীনের সব কিছুই একমাত্র তাঁদেরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এ প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে অথবা তাদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের মূল ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে এবং কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

হাফিজ ইবন আবদুল বার' (রহ.) সাহাবীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুহ্বত ও তাঁর সুন্নাতের হিফাজত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ্ তায়ালা এ সব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। আর এ কারণেই তাঁরা 'খায়রুল কুরুন' ও 'খায়রু উম্মাতিন'-এর মর্যাদার অধিকারী হন।

কোন কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। ইবন হাজার আস্কালানী (রহ.) ইমাম ইবন হাযাম (রহ) এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন : 'আস্-সাহাবাতু কুল্লুহুম মিন্ আহ্লিল্ জান্নাতী কাত্আন' অর্থাৎ 'সাহাবীদের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের গালি দেওয়া বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"আল্লাহ্, আল্লাহ্, আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করোনা। তাদেরকে যারা ভালবাসে, আমার মহব্বতের খাতিরেই তারা ভালবাসে, আর যারা তাদেরকে হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে।"

আল্-কুরআনের অনেক আয়াতে ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে একটি আয়াত অর্থসহ উদ্ধৃত হলো :

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

অর্থ : "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তাঁর সাথী-সাহাবী, তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অতীব বিনম্রহৃদয়, সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে কখনো বা রুকূ অবস্থায়, কখনো

বা সিজ্‌দারত অবস্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে। তাঁদের চেহারায় থাকবে দীপ্তিমান চিহ্ন সিজদার কারণে। তাদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তাওরাতে এবং ইঞ্জিলেও।"[১]

উপরোক্ত আয়াতের প্রথম দিকে বলা হয়েছে : আর যারা তাঁর সান্নিধ্য ও সোহবত লাভে ধন্য, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, আর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে তাঁরা খুবই সহানুভূতিশীল।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরূপ আদেশ দিয়েছেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

অর্থ : "হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন।"[২]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَتَوَ لَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.

অর্থ : "আর তোমাদের মধ্যে যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।"[৩]

অতএব জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য হলো– যুদ্ধরত কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠিন ও কঠোর থাকা, আর মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, অতীব বিনম্র চিত্তের অধিকারী থাকা। অবশ্য যে সব কাফির যুদ্ধরত নয়; বরং শান্তিপ্রিয়, তাদের সাথে মুসলমানগণ সদয় ব্যবহার করেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা সে ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা। রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন :

যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করেনা, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ বর্ণিত।)

---

১. আল্-কুরআন, সূরা আল্-ফাত্‌হ : ২৯ আয়াত।
২. আল্-কুরআন।
৩. আল্-কুরআন।

আর এজন্যই আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

অর্থাৎ "তারা পরস্পর অত্যন্ত বিনম্রচিত্ত, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাদের বৈশিষ্ট্য।"

মদীনায় হিজরতের পর যখন রাসূলুল্লাহ (স.) আনসার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ

অর্থাৎ "এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।" তখন আনসার সাহাবীরা মুহাজির সাহাবীদের নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন। ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, জায়গা-সম্পত্তি সবই নিজের ভাইয়ের মত ভাগ করে দেন। এমনকি যে আনসার সাহাবীর একাধিক স্ত্রী ছিল, মুহাজির ভাইয়ের পছন্দ সাপেক্ষে তাকে তালাক দেন; যাতে ইদ্দত শেষ হলে মুহাজির ভাই তাকে স্ত্রী হিসেবে বিবাহ করতে পারে।

সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন :

تَرَهُمْ رُكَّعًا سُجُدًا.

অর্থাৎ "তুমি তাদেরকে দেখবে কখনো রুকূ অবস্থায়, আর কখনো সিজ্দারত।" কেননা তারা সালাতে মশগুল থাকতে ভালবাসে।

আর হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

اَلصَّلَوٰةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ "সালাত হলো মু'মিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ।"

সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন :

يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا.

অর্থাৎ সাহাবীরা আল্লাহ পাকের দান এবং সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণকারী ছিলেন। তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা। জীবনের যাবতীয় কাজ তাঁরা এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করতেন।

সাহাবীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন :

سِيْمَا هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُجُوْدِ.

অর্থাৎ তাঁদের চেহারায় থাকবে দীপ্তিমান চিহ্ন সিজ্‌দার কারণে।"

এর অর্থ হলো : কিয়ামতের দিন তাঁদের মুখম-লে নূর চমকাতে থাকবে। যাতে সকলে জানতে পারবে যে, তাঁরা সিজ্‌দা করতে ভালবাসতেন এবং সিজ্‌দা করতেন, বেশী বেশী করে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের জন্য বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে প্রশংসা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা।"

তিনি (স.) আরো বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দেবে না। কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমান সোনাও ব্যয় কর, তবুও তাদের যে কোন একজনের 'মুদ' বা তার অর্ধেক পরিমান যবের সমতুল্য হবে না।

মিশ্‌কাত শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে একটি ফিরকাই নিশ্চিত জান্নাতী। জিজ্ঞেস করা হলো : তারা কে? রাসূলুল্লাহ (স.) জবাবে বললেন :

যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

বস্তুত সাহাবীরা ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁদের কর্মকা- মানব জাতির জন্য উত্তম নমুনা স্বরূপ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সততা, বিশ্বস্ততা, আত্মত্যাগ ও সদাচরণ তুলনাহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। অন্যের প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা মূল্য দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজীরবিহীন। রাসূলুল্লাহ (স.) ইত্তেবা ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। আর তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য।

*** আহ্‌লে বাইয়াতের মর্যাদা :**

আল্-কুরআনে মহান-আল্লাহ্ 'আহ্‌লে বাইত' সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেছেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

অর্থ : "হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখতে চান।"[৪]

এখানে 'আহলে বাইত' দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিবার, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীও পুত্র-কন্যাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) ও আহলে-বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বাড়ী থেকে বাইরে যাচ্ছিলেন; সে সময় তাঁর গায়ে একটি কালো রুমী চাদর ছিল। এমন সময় সেখানে, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা) আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এঁদের সবাইকে চাদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে উপরোক্ত আয়াত তেলাওত করেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, উক্ত আয়াত তেলাওত করার পর তিনি ইরশাদ করেন :

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ اَهْلِ بَيْتِيْ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! এরাই আমার আহ্‌লে-বাইত।" (ইবনে জরীর বর্ণিত।

ইবনে-কাসীর (র) এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসফিরগণ প্রদত্ত এ সব মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যারা বলেন যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পূণ্যবতী স্ত্রীদের শানে নাযিল হয়েছে এবং 'আহ্‌লে-বাইত' বলে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাদের এ মতে অন্যান্যগণ ও আহ্‌লে-বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভালবাসতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : আমার আহ্‌লে-বাইত নূহ (আ.)-এর কিশ্‌তীর ন্যায়, যারা তাঁদের সাথে মহব্বত রাখবে এবং তাঁদের অনুসরণ করবে, তারা সব ধরনের ফিত্‌না-ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আখিরাতে জান্নাতের অধিকারী হবে।

❖❖❖

৪. আল্-কুরআন, সূরা আহ্‌যাব : ৩৩ আয়াত।

প্রবন্ধ-২

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ

পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (স.)এর শিক্ষা অতুলনীয়। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা দুনিয়ার ইতিহাসে চিরভাস্কর হয়ে রয়েছে।

তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কারঃ

* হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময়ে সারা বিশ্বে বিশেষ করে আরবদেশে নানা ধরণের কুশিক্ষা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা প্রধানত পৌওলিক, য়াহুদী, নাসারা ও দীনে হানীফের অনুসারী ছিল।

পৌওলিকরা মূর্তি উপাসক ও জড় পূজারী ছিল। তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার অহ্দানিয়াত বা একত্ববাদ ভুলে গিয়ে পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-বৃক্ষ, আগুণ এবং কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা ও আরাধনা করতো। সারা জাহানের রব আল্লাহ্ তায়ালা সম্বন্ধে তাদের কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না।

ফলে, তাদের অনেকেই চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রকে প্রভু বলে পূজা করতো, কেউ বা আগুনের পূজা করতো, আবার কেউ কল্পিত দেব-দেবীর সামনে মাথানত করে তাদের সাহায্য চেত। এ মর্মে আল্-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

অর্থ : "আর তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে, এ আশায় যে, হয়তো তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।"[৫]

এর ফলে মানব সমাজে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও কলহের সৃষ্টি হয়, মানুষ একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং সমাজে সর্বত্র অশান্তি সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.) দুনিয়াতে আসেন এবং তাওহীদ ও একত্ববাদের বাণী প্রচার করেন।

তিনি বলেন : সারা জাহানের রব হলেন আল্লাহ্ তায়ালা। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ইত্যাদি। এমর্মে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

---

৫. আল্-কুরআন, সূরা ইয়াসীন : ৭৪ আয়াত।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

অর্থ : "আর তোমাদের ইলাহ্, এক ইলাহ, তিনি ছাড়াআর কোন ইলাহ্ নেই; তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।"[৬]

* প্রাক-ইসলামী যুগে কোন কোন মানুষ ধারণা করতো যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন, এর পালন কর্তা ভিন্নজন এবং প্রলয়কর্তা অন্যজন। এভাবে তারা তিন সত্তাকে মাবূদ মনে করতো। নাসারারা হযরত ঈসা (আ:) কে আল্লাহ্র পুত্র বলতো। আর য়াহুদীরা হযরত উজায়ের (আ:) কে আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করতো। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এ সব ভ্রান্ত মতবাদ খাঁন করে বলেন : "আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই।" নাসারাদের মতবাদ খাঁন করে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থ : "নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে– মসীহ ইবন মরিয়মই আল্লাহ্।"[৭]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন :

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

অর্থ : "নিশ্চয় তারা তো কাফির, যারা বলে– আল্লাহ্ তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন।"[৮]

উল্লেখ্য যে, শিরকের গুনাহ অত্যন্ত মারাত্মক। মহান আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না।

এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করাকে, আর তিনি ক্ষমা করবেন এ ছাড়া সব কিছু যাকে ইচ্ছা।"[৯]

---

৬. আল্-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৬৩ আয়াত।
৭. আল্-কুরআন, সূরা মায়িদাহ : ৭২ আয়াত।
৮. আল্-কুরআন, সূরা মায়িদাহ : ৭৩ আয়াত।
৯. আল্-কুরআন, সূরা নিসা : ১১৬ আয়াত।

* প্রাক-ইসলামী যুগে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হাশর, নাশর, জান্নাত, জাহান্নামকে বিশ্বাস করতো না। তারা পাপ-পূণ্যের বিচারে বিশ্বাস করতো না। সে কারণে তারা অন্যায় ও পাপ কাজে নিমজ্জিত থাকতো এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকতো। তারা আখিরাতকে আদৌ বিশ্বাস করতো না। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের কাছে এ ঘোষণা দেন যে, মানুষ দুনিয়াতে যে যেমন কাজ করবে, সে আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে। পাপী ব্যক্তিরা যাবে জাহান্নামে এবং নেক্কার ব্যক্তিরা যাবে জান্নাতে। এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

অর্থ : "অতএব কেউ অনু-পরিমান নেক-কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অনু-পরিমান বদ-কাজ করলে, সেও তা দেখতে পাবে।"[১০]

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন :

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾

অর্থ : "তখন যার নেকীর পাল্লা ওযনে ভারী হবে, সে তো শান্তিময় জান্নাতে জীবনযাপন করবে। আর যার পাল্লা ওযনে হাল্কা হবে, তার বাসস্থান হবে হাবিয়া নামক দোযখে।"[১১]

* হযরত মুহাম্মদ (স.) পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেন। মানব জাতির হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ

অর্থ : "আমরা তাঁর (আল্লাহ্র) রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।"[১২]

---

১০. আল্-কুরআন, সূরা যিল্যাল : ৭-৮ আয়াত।
১১. আল্-কুরআন, সূরা কারিআ' : ৬-৯ আয়াত।
১২. আল্-কুরআন, সূরা বাকারা : ২৮৫ আয়াত।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের হিদায়েতের জন্য নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ

অর্থ : "আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।"[১৩]

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন জাতি ও কাওমের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তায়অলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন সারা জাহানের সব মানুষের জন্য। এ মর্মে আল্লাহ্‌ তযায়ালার ইরশাদ :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

অর্থ : "আপনি বলুন : হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরিত।"[১৪]

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে দুনিয়াতে আর কোন নবী আসবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে ইরশাদ করেছেন :

اَنَا خَاتَمَ الْنَّبِيِّيْنَ وَلاَنَبِيَّ بَعْدِىْ.

অর্থ : "আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না।"[১৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সত্য দ্বীনসহ দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন, তা হলো– ইসলাম। আর আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো– ইসলাম। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হলো– ইসলাম।"[১৬]

---

১৩. আল্-কুরআন, সূরা নাহ্‌ল : ৩৬ আয়াত।
১৪. আল্-কুরআন, সূরা আ'রাফ : ১৫৮ আয়াত।
১৫. আল্-হাদীস বর্ণিত।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ স্বীকার করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ দ্বীনের সব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তা পালন করতে হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নামায আদায় করার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জোর তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

مُرُوْا اَوْلاَدُكُمْ بِالصَّلَوَةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِ بُوْاهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرَسِنِيْنَ

অর্থ : "তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েদের নামাযের জন্য নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে, তখন প্রয়োজনে তাদের মারধর করে হলেও নামায পড়াবে।"[১৭]

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেন যে, কুরআন ও হাদীস মানব জাতির জন্য মুক্তির সনদ। তাই সব অবস্থায় কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। তাহলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে না। এ জন্য তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন :

"আমি তোমাদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব বা কুরআন এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বা হাদীস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এর অনুসরণ কর, তবে তোমরা গুমরাহ্‌বা পথভ্রষ্ট হবে না।"[১৮]

বস্তুত: হিদায়েতের দায়িত্ব দিয়ে মহান আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। তাই তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলেন :

يَاَيُّهَاالنَّاسُ قَوْلُوْا لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهُ تُفْلِحُوْا

অর্থ : "হে মানুষেরা! তোমরা বল: আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল।"[১৯]

---

১৬. আল্‌-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৯ আয়াত।
১৭. আল্‌-হাদীস, বুখারী-মুসলিম বর্ণিত।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. আল্‌-হাদীস বর্ণিত।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাই আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। পক্ষান্তরে, যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, তারা জাহান্নামে যাবে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।"[২০]

আর যারা আল্লাহ্র প্রতি, রাসূলের প্রতি, ফিরিশতার প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, কিয়ামত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তারা জান্নাতে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

অর্থ : "অবশ্যই যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার অনন্তকাল বসবাসের জন্য জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[২১]

বস্তুত: উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মানুষের কাছে যে দ্বীনি বা ধর্মীয় শিক্ষা রেখে গেছেন এবং দ্বীনি সংস্কার সাধন করে গেছেন, তা গোটা মানব জাতির জন্য মুক্তির সনদ ও শান্তির দিশারী।

উল্লেখ্য যে, মানুষের চিরস্থায়ী জীবনে অবস্থানের জায়গা হলো আখিরাত। যার শুরু হয়ে মৃত্যু দিয়ে। এরপর কবর, হাশর, বিচারান্তে পুলসিরাত পার হতে

২০. আল্-কুরআন, সূরা বায়্যিনা। : ৬ আয়াত।
২১. আল্-কুরআন, সূরা বায়্যিনা : ৭-৮ আয়াত।

পারলে জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম। মুমিন ব্যক্তি চিরদিন জান্নাতে থাকবে এবং বেঈমানদের থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম।

আর কারা জান্নাতী হবে এবং কারা জাহান্নামে যাবে, তা নির্ধারণের জন্য কর্মময় জীবন হলো এ দুনিয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الاَخِرَةِ

অর্থাৎ "দুনিয়া হলো আখিরাতের জীবনের জন্য ক্ষেত-স্বরূপ।"[২২]

স্মর্তব্য যে, দুনিয়ার জীবনই একমাত্র কর্মময় জীবন। এখানে সবাই কাজে ব্যস্ত। কেউ ভাল কাজে ব্যস্ত, আর কেউ খারাপ কাজে। কেউ কেবল দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত, আবার কেউ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত। কেননা, তারা জানে এবং মানে, এ দুনিয়ার সব কিছুই এখানে থাকবে। ব্যক্তির সংগে যাবে তার আমল। আর আমল যদি ভাল হয়, তবে তা আখিরাতের জীবনে উপকারে আসবে এবং সবশেষে সে ব্যক্তি যাবে জান্নাতে, নয়তো জাহান্নামে।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য সৌন্দর্য এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের জন্য কোন কাজ উত্তম, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

অর্থ : "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা, আর স্থায়ী নেক-আমল তোমার রবের কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে ও শ্রেয় এবং আশার দিক দিয়েও উত্তম।"[২৩]

আয়াতে উল্লেখিত 'আল্-বাকিয়াতুস্ সালিহাত' অংশটি প্রনিধান যোগ্য। যার অর্থ হলো– চিরস্থায়ী নেক-আমল, যা ধ্বংস হবে না, আর এর বিনিময় পাওয়া

২২. আল্-হাদীস, মিশকাত বর্ণিত।
২৩. আল্-কুরআন, সূরা কাহ্ফ : ৪৬ আয়াত।

যাবে অনন্তকাল ধরে। আর তা হলো– জান্নাত। 'রূহ্' সৃষ্টি হয়েছে, এর ধ্বংস নেই। অপরপক্ষে, রূহকে ধারণ করার জন্য আধার বা বাহন হিসাবে যে দেহকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ধ্বংসশীল। তাইতো দেখা যায়, ব্যক্তির দেহ থেকে রূহ বের হয়ে গেলে, দেহের সব অংগ-প্রত্যঙগ সঠিক থাকলেও, কোনটা কাজ করে না। যেমন, চোখ থাকে, কিন্তু তা দেখেনা; কান থাকে, শোনেনা, মুখ থাকে, কথা বলেনা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা বর্ণনা করেছেন। কোন শিক্ষা বা আমল ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং কি কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে, তা স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন।

আল্লাহ্ আমাদের বেশী বেশী নেক-আমল করার তাওফীক দান করুন এবং চিরস্থায়ী জান্নাত নসীব করুন। আমীন!!

প্রবন্ধ-৩

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর পরে দুনিয়াতে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবে না। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে তাঁর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[২৪]

মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি সকলের জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। তাঁর মত এতবড় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক আর কেউ ছিলেন না।

উল্লেখ্য যে, মদীনায় হিযরতের পর তিনি যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই ছিলেন এর কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ছিলেন এ রাষ্ট্রের প্রধান, যুদ্ধের ময়দানে কমান্ডার-ইন্-চিফ, প্রধান বিচারপতি, মসদিদে নববীর ইমাম ইত্যাদি।

মসজিদে নববীই ছিল সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রভূমি। এখানে তিনি সাহাবীদের নিয়ে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করতেন। দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কার্যক্রম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে বসেই পরিচালনা করতেন। তিনি এখানে বসেই রোম-সম্রাট, পারস্য সম্রাট, আবিসিনিয়ার সম্রাট, মিসরাধিপতি প্রভৃতি তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর ব্যক্তিদের নিকট ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাথে এখানে সাক্ষাৎ দান করতেন। যুদ্ধের জন্য সেনা-বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ মসজিদ থেকেই দিতেন। এখানে বসেই তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং অপরাধীদের মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিতেন।

---

২৪. আল্-কুরআন, সূরা আহযাব : ২১ আয়াত।

উল্লেখ্য যে, এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন। তিনি মদীনায় এসে দেখতে পান যে, প্রধানত: সেখানে তিন শ্রেণীর লোক বসবাস করে :

১. মদীনার আদিম পৌওলিক সম্প্রদায়,

২. বিদেশী য়াহুদী সম্প্রদায় এবং

৩। নব-দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। এদের কারোর সাথে কারোর মিল তো ছিলই না, তারপর আবার ছিল দলগত হিংসা-বিদ্বেষ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন য়াহুদীরা ভেবেছিল, তাদের 'মসীহ্' আস্ছেন। শিক্ষাদীক্ষা এবং ধনবলে তারাই ছিল শক্তিশালী। কাজেই তাদের বিশ্বাস ছিল, তরা হযরতকে তাদের দলে নিতে পারবে।

কিন্তু ইসলামের ধ্যান-ধারণা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা যতই পরিচিত হলো, ততই বুঝতে পারলো যে, তাদের এ আশা সফল হবার নয়। কাজেই নবীকরীম (স.)-এর উপর থেকে তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমেই চলে যেতে থাকে।

মদীনার আদিম পৌওলিক সম্প্রদায় প্রথম দিকে কিছুই বলেনি, কারণ তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইসলামকে একটি স্বতন্ত্র শক্তিরূপে দেখতে পেয়ে, তারাও মনে মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে থাকে।

মহানবী (স.) মদীনাবাসীদের মনোভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সিদ্ধান্ত নেন যে, ধর্মমত যার যা-ই থাকুক না কেন, তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি না থাকলে মদীনার কল্যাণ হবে না। কেননা, প্রত্যেক দেশের স্বার্থ ও কল্যাণ নির্ভর করে তার অধিবাসীদের সংহতি ও একাত্মবোধের উপর। যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে, সে দেশে পরমত সহিষ্ণুতার প্রয়োজন অনেক বেশী। "নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচতে দাও" এটাই হলো নাগরিক জীবনের সর্বপ্রথম নীতি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে এই মৌলিক অধিকারটুকু চেয়েছিলেন, কিন্তু মক্কার কুরায়েশরা তাঁকে এ অধিকার দেইনি, বরং হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। যার ফলে তিনি হিযরত করে মদীনায় আসেন।

মদীনায় এসে তিনি সহ-অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন। সকলের সাথে বন্ধুভাবে বসবাস করার লক্ষ্যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে একটি সম্মেলন করেন এবং সকলকে আন্ত: সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির আবশ্যকতা বুঝিয়ে দেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তিনি একটি সনদ বা আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্র ও (International Magna Charta) প্রস্তুত করেন, যাতে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। সকলেই সে সন্ধিপত্র মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করে।

উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই সনদপত্রে মহান রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের কী মহান অত্যুজ্জল আদর্শ স্থাপন করেন, তার কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো :[২৫]

"লিখিত সনদ"

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম"

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (স.) বিশ্বাসী দেরকে এবং যারাই তাঁর সাথে যোগ দেবে তারা সকলকে এ সনদ দিতেছেন :

১. মদীনার য়াহুদী, নাসারা, পৌওলিক এবং মুসলিম সকলেই এক দেশের অধিবাসী। কাজেই সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। য়াহুদী, নাসারা, পৌওলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২. কেউ-ই মুহাম্মদ (স.)-এর বিনানুমতিতে কারোর সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না।

৩. নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করতে হবে।

৪. বাইরের কোন শত্রুর সাথে কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৫. মদীনা নগরীকে পবিত্র মনে করতে হবে এবং এ নগরী যাতে কোন বহি: শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. যদি কোন শত্রু কখনো মদীনা আক্রমণ করে, তবে তিন সম্প্রদায় সমভাবে তাকে বাধা দেবে।

৭. যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করবে।

৮. নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে, অথবা শত্রুর সাথে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে, তার জন্য সমুচিত শাস্তির বিধান করা হবে– যদি সে আপন পুত্র হয়। তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে না।

---

২৫. এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল।

৯. হযরত মুহাম্মদ (স.) এ রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং পদাধিকার বলে তাঁকে মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো ইত্যাদি।

এ হলো লিখিত সনদের সারমর্ম। এ ঘটনার পর ইসলাম এক নতুন ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। এতদিন যা ছিল কতিপয় বিধি-নিষেধ ও নীতি-বাক্যের সমষ্টি মাত্র; রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায়, সমাজ ব্যবস্থায়, নাগরিক জীবনে বা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে তা কিভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে, তা তখন বুঝা সম্ভব হয়নি। অন্য কথায়– এর রাজনৈতিক বা রাষ্ট্ররূপ এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল। মদীনায় আসার পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এদিকে দৃষ্টি দেন। ফলে, রাষ্ট্র ও সমাজ-বিধানের সূত্রপাত এখানেই হয়।

বস্তুত: ইসলামী রাষ্ট্র মানবতা-বিকাশের এক নতুন সংস্থা। এতদিন বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে মানব সমাজ বিভক্ত হয়েছিল। যাদের মধ্যে কোন সদ্ভাব-সম্প্রীতি ছিল না। সফল নাগরিকের অধিকার সমান, এটা অচিন্ত্যনীয় ছিল। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম এ অভাব অনুভব করেন। তাই নিজ-নিজ ধর্মের ব্যাপারে তিনি বলেন; যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

অর্থাৎ "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।"[২৬]

মহানবী (স.) গোত্র ও জাতির মধ্যেকার ভেদাভেদ তুলে দিয়ে, সব মানুষ যে সমান, এ সম্পর্কে বলেন :

"আজমী বা অনারবদের আরবীদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তদ্রুপ আরবদের উপর আজমীদের কোন প্রাধান্য নেই; কালোর উপর শাদার কোন শ্রেষ্ঠ নেই। তদ্রুপ শাদার উপর কালোর কোন প্রাধান্য নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম (আ:) কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২৭]

বস্তুত : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্য এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, যেখানে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজ-নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-কালচার বজায় রেখে একই দেশে, এক সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

---

২৬. আল্-কুরআন, সূরা কাফিরুন : ৬ আয়াত।

২৭. আল্-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত। এটি বিদায় হজ্জের ভাষণ।

উল্লেখ্য যে, প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এখানে। অনেকে এর ভুল ব্যাখ্যা করেন। তাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্র হলো– পূর্ণ ইসলামী শরীয়তের রূপায়ন ক্ষেত্র। নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ইসলামী বিধান কেবল এখানে কায়েম হবে।

কিন্তু ইসলামী হুকুমতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা একই রাষ্ট্রে কিরূপে মিলে-মিশে বসবাস করতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র হবে তার দৃষ্টান্তস্থল।

অন্যভাবে বলা যায়, উদার মানবতা ও বিশ্ববোধই ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রেরণা। যে রাষ্ট্রে শুধু মাত্র ইসলাম চর্চা হয়, সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র নয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শরীয়তের যে কঠোরতা সম্ভব, ইসলামী রাষ্ট্রে বরং তা অনেক ক্ষেত্রে শিথিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় :

ইসলামী সমাজে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে মূর্তি পূজার উচ্ছেদ একরূপ অসম্ভব; কেননা, সেরূপ করতে গের পৌওলিক বা মূর্তি পূজারীদের ধর্মে আঘাত দেয়া হয়। যা আল্লাহ্‌র বিধানে সমর্থিত নয়। এভাবে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে তাদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর আঘাত না আসে।

একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর আগে সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-নায়ক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'মদীনা সনদের' মাধ্যমে মানবতার মুক্তি ও শান্তির জন্য যে কালজয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা আজ মহা-মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। বর্তমান পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ একই কথা বলছে এবং একই চিন্তা করছে। যার ফল শ্রুতিতে অশান্ত পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে লীগ অফ নেশন্‌স (League of nations), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO), আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter), মানবাধিকারের ঘোষণা (Declaration of Human Rights) প্রভৃতি শান্তিকামী প্রতিষ্ঠান; যার রূপকার হলেন রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাই বিনা দ্বিধায় বলা যায়, এ সবই বিশ্বনবীর চিন্তা, ধ্যান ও স্বপ্নের ফসল।

বস্তুত: বর্তমান বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ যে এক পৃথিবীর (One World) স্বপ্ন দেখছে, অথবা বিশ্ব-গভর্নমেন্ট (Global Government)-এর চিন্তা করছে, তার মূল উৎস ও এই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

❖❖❖